রাজা চন্দ্রের মেহরৌলি লৌহস্তম্ভলিপি

(নিত্যকালের দুই পুরাতন গ্রন্থে আলোচ্য অভিলেখের আলোচনা থেকে সংক্ষেপিত)

মূলপাঠ

যস্যোদ্বর্তযতঃ প্রতীপমুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্
বঙ্গেষাহববর্ত্তিনো'ভিলিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তির্ভুজে।
তীর্ত্বা সপ্ত মুখানি যেন সমরে সিন্ধোর্জিতা বাহ্লিকা
যস্যাদ্যাপ্যধিবাস্যতে জলনিধির্বীর্য্যানিলৈর্দক্ষিণঃ।।১
খিন্নস্যেব বিসৃজ্য গাং নরপতের্গামাশ্রিতস্যেতরাং
মূর্ত্যা কর্ম্মজিতাবনিং গতবতঃ কীর্ত্যা স্থিতস্য ক্ষিতৌ।
শান্তস্যেব মহাবনে হুতভুজো যস্য প্রতাপো মহা-
ন্নাদ্যাপ্যুত্সৃজতি প্রণাশিতরিপোর্যত্নস্য শেষঃ ক্ষিতিম্।। ২
প্রাপ্তেন স্বভুজার্জিতঞ্চ সুচিরঞ্চৈকাধিরাজ্যং ক্ষিতৌ
চন্দ্রাহ্বেন সমগ্রচন্দ্রসদৃশীং বক্ত্রশ্রিযং বিভ্রতা।
তেনাযং প্রণিধায ভূমিপতিনা ভাবেন বিষ্ণৌ মতিং
প্রাংশুর্বিষ্ণুপদে গিরৌ ভগবতো বিষ্ণোর্ধ্বজঃ স্থাপিতঃ।। ৩

আলোচনা

প্রাপ্তিস্থান : নূতন দিল্লি নগর থেকে ৯ মাইল দক্ষিণে মেহরৌলিতে কুতুবমিনারের কাছে কুব্বত-উল্-ইসলাম মসজিদে শুণ্ডাকৃতি লৌহস্তম্ভে এই অভিলেখটি উৎকীর্ণ আছে। মেহরৌলির প্রাচীন নাম ছিল মিহিরপুরী। এই স্তম্ভটি অবশ্য প্রথমে বিষ্ণুপদগিরিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে কোনো এক উৎসাহী রাজা এটিকে দিল্লিতে নিয়ে আসেন।

লিপি: খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর উত্তরভারতীয় উত্তরকালীন ব্রাহ্মীলিপিতে এটি লেখা হয়েছিল।

ভাষা: সংস্কৃত। এই অভিলেখে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে লেখা তিনটি শ্লোক রয়েছে। সংক্ষিপ্ত হলেও অভিলেখটি উত্তম কাব্যরূপে পরিগণিত হবার যোগ্য। এর

Scanned with CamScanner

অনামা কবি বৈদর্ভী রীতিতে চন্দ্র নামক রাজার প্রতাপ বর্ণনা করতে গিয়ে চমৎকার ভাবে বিভিন্ন অলঙ্কারের সাঙ্কর্য নির্মাণ করেছেন। ঐ সময়ে রচিত অভিলেখসমূহে এরকম মিশ্র অলঙ্কারের প্রয়োগ দুর্লভ। বিশেষতঃ দ্বিতীয় শ্লোকটিতে উৎপ্রেক্ষা-উপমা-অতিশয়োক্তির পরম সুন্দর সন্নিবেশ সহৃদয়হৃদয়লোভন। এই ক্ষুদ্র পরিসরে অনুকূল শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে বীররসের সার্থক প্রকাশও লক্ষণীয়।

বিষয়বস্তু: "চন্দ্র" নামধারী কোনো এক রাজার প্রশস্তি এই অভিলেখে পাওয়া যাচ্ছে। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে এটি তাঁর মরণোত্তর প্রশস্তি। অভিলেখের দ্বিতীয় শ্লোকটির উপর ভিত্তি করে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু বালসুব্রমণিয়ম্ ও প্রভাকর Current Science গবেষণা পত্রিকার একটি প্রবন্ধে (৯২ খণ্ড, ১২ সংখ্যা, ২৫ জুন, ২০০৭) বলেছেন মুদ্রা ও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য থেকে নিশ্চিত ভাবে জানা যায় যে ঐ প্রশস্তি মরণোত্তর হতে পারে না। ভান্ডারকরও একে মরণোত্তর মনে করেন না। দীনেশচন্দ্র সরকার অবশ্য ঐ শ্লোকের পদবিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন যে, এটি চন্দ্রের মৃত্যুর পরেই লেখা হয়েছিল। তাঁর মতে এই রাজা চন্দ্র গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যিনি পরিণত বয়সে স্তম্ভটি নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত প্রশস্তিটি খোদাই করান।

চন্দ্রের প্রতাপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন - তাঁর বাহুতে খড়্গের দ্বারা তাঁর যশ খোদিত হয়েছিল অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রাঘাতে সৃষ্ট ক্ষতচিহ্নগুলি তাঁর যশ ঘোষণা করত। বঙ্গদেশের যুদ্ধাঙ্গনে শত্রুদের সমবেত আক্রমণকেও তিনি অনায়াসে প্রতিহত করেছিলেন। সিন্ধুনদের সপ্তমুখ অতিক্রম করে তিনি বাহ্লীক জয় করেছিলেন। দক্ষিণসমুদ্রও তাঁর কীর্তিসৌরভে ব্যাপ্ত হয়েছিল। নিজ ভুজবলে বিজিত সমগ্র ধরণীকে একচ্ছত্ররূপে দীর্ঘকাল শাসন করে যেন নূতন প্রদেশ জয় করার ইচ্ছায় তিনি অন্য পৃথিবীকে আশ্রয় করেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেও তাঁর প্রতাপ অদ্যাপি পৃথিবীতে উত্তাপ সঞ্চার করছে। এই অভিলেখে রাজা চন্দ্রের বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ ঘটেছে। অন্তিম শ্লোকে বলা হয়েছে এই চন্দ্ররাজ বিষ্ণুপদ পর্বতে ভগবান বিষ্ণুর ধ্বজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্তম্ভটি গুপ্তযুগের ধাতুবিদ্যার চরম উৎকর্ষের সাক্ষী। এতে অদ্যাপি মরচে পড়েনি। তাছাড়া বালসুব্রমণিয়ম্ ও প্রভাকর Current Science গবেষণাপত্রিকার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বলেছেন যে, ঐ যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতির প্রমাণও এই স্তম্ভটি বহন করছে। তাঁদের মতে যে বিষ্ণুপদগিরিতে স্তম্ভটি আদৌ বর্তমান ছিল, সেটির হল বেসনগর, বিদিশা ও সাঁচীর অতি সন্নিকটে ইদানীন্তন উদয়গিরি। এই উদয়গিরি

Scanned with CamScanner

কর্কটক্রান্তিরেখার ঠিক উপরে অবস্থিত। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, স্তম্ভটি জ্যোতির্বিদ্যার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সূর্যের উত্তরায়ণের সময় প্রভাতকালে এই স্তম্ভের ছায়া ১৩ নম্বর গুহার অনন্তশয়ন বিষ্ণুর পদমূল স্পর্শ করত।

সাধারণ আলোচনা ও গুরুত্ব : এক সময় এই অভিলেখে উল্লিখিত চন্দ্রাহ্ব অর্থাৎ চন্দ্র নামধারী রাজার পরিচয় বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতবিরোধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন দৃঢ় যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করা গেছে যে, এই চন্দ্র আসলে গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৭৫-৪০৪ খ্রিস্টাব্দ)। গুপ্ত সম্রাটদের (৩২০-৬০০ খ্রি.) তীরন্দাজ প্রতিকৃতিযুক্ত মুদ্রাসমূহের বিশদ ধাতুতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়েছে [দ্রষ্টব্য Current Science গবেষণাপত্রিকার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ]। লিপিতত্ত্বের দিক থেকেও নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, এই অভিলেখের অক্ষরগুলি গুপ্তযুগীয় ব্রাহ্মী লিপির প্রতিনিধি এবং এই লিপির কাল খ্রিস্টির পঞ্চম শতাব্দীর আগে হওয়া সম্ভব নয়। যাই হোক আমরা চন্দ্ররাজের পরিচয়কে কেন্দ্র করে বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ এযাবৎ যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে চন্দ্ররাজ হলেন প্রথম কনিষ্ক। তাঁর যুক্তি এই রকম - একটি খোটানী পুথির অংশবিশেষ থেকে জানা যায় প্রথম কনিষ্কের অন্য নাম ছিল চন্দ্র। তিনি বল্‌খের অধিপতি ছিলেন ও তাঁর বংশের উদ্ভবও যে সেদেশেই হয়েছিল তাও এই পুথিতে উল্লিখিত একটি উপাখ্যান থেকে জানা যায়। অর্থাৎ কনিষ্ক যে কুষাণবংশীয় ছিলেন সেই ব্যাপারটির দ্বারা চন্দ্রের বাহ্লীক দেশ জয়ের সমর্থন মেলে। কুষাণদেরই এই কৃতিত্ব রয়েছে যে বাহ্লীক দেশ বা ব্যাক্ট্রিয়া তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে কনিষ্ক বাহ্লীকের অধিপতি ছিলেন। যদিও কনিষ্কের বঙ্গবিজয়ের সপক্ষে কোনো নির্দিষ্ট তথ্যাদি পাওয়া যায় না, তার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়। কনিষ্কের তৃতীয় রাজ্যবর্ষে বারাণসীতে তাঁর ক্ষত্রপগণ শাসন করতেন। ট্রাতিশন বলে, তিনি পাটলিপুত্রের তদানীন্তন রাজাকে আক্রমণ করেছিলেন। এই সূত্রে এমন অনুমান করাই যায় যে তিনি বঙ্গাধিপতিকেও আক্রমণ করেছিলেন। উৎখনন করে বঙ্গ ও উৎকল (উড়িষ্যা) দেশে কুষাণমুদ্রা ও পুণ্ড্রবর্ধনে (মহাস্থানগড়) কনিষ্কের সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। এর দ্বারাও কনিষ্কের বঙ্গাভিযান অনুমান করা যায়।

কিন্তু এই যুক্তিপরম্পরা বলবতী নয়। মেহরৌলি স্তম্ভলেখের তৃতীয় শ্লোকে চন্দ্রাহ্বেন পদটি থেকে বোঝা যায় রাজার মুখ্য নাম ছিল চন্দ্র। খোটানী পুথিতে

Scanned with CamScanner

কিন্তু চন্দ্রকনিষ্ক এই শব্দ রয়েছে যা থেকে বোঝা যায় কনিষ্ক নামে বিখ্যাত রাজার গৌণ নাম ছিল চন্দ্র। তাছাড়া ঐ পুথির প্রামাণ্যও নিঃসন্দিগ্ধ নয়। আর, পুথিতে লব্ধ উপাখ্যানে দেখা যাচ্ছে কনিষ্ক গোড়া থেকেই বল্‌খদেশের শাসকদের বংশে জাত অর্থাৎ সিংহাসনারোহণের সময় থেকেই তিনি ঐ দেশের অধিপতি। ফলে তাঁর নতুন করে বাহ্লীক জয়ের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কনিষ্কের পাটলিপুত্র আক্রমণের কাহিনী কিংবদন্তী মাত্র। তার কোনো উল্লেখ কোনো প্রামাণ্য আকরে নেই। কিন্তু চন্দ্ররাজের সাম্রাজ্যে আগে থেকেই মগধ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখান থেকে পূর্বদিকে অভিযান করে তিনি বঙ্গ পর্যন্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে গিয়েছিলেন। অল্পসংখ্যক মুদ্রার আবিষ্কারও কনিষ্কের বঙ্গ আক্রমণের কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণরূপে গণ্য হতে পারে না। কারণ বাণিজ্য, তীর্থযাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমেও দেশ থেকে দেশান্তরে মুদ্রারা ভ্রমণ করে থাকে। এই অভিলেখের লিপিও কুষাণযুগের ব্রাহ্মী লিপি নয় যা কুষাণদের অন্যান্য অভিলেখে দেখা যায়। এই লিপি আকার-প্রকারে নিঃসন্দেহে গুপ্তযুগীয়।

এইচ. সি. শেঠ চন্দ্ররাজকে নিম্নলিখিত যুক্তিপুরঃসর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গে শনাক্ত করতে আগ্রহী -

রাজা চন্দ্র সম্পর্কে প্রশস্তিতে যা যা বলা হয়েছে তা সামগ্রিক ভাবেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অনুরূপ। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য উত্তরাধিকার সূত্রে বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করেননি, নিজের বলবীর্যের সাহায্যেই তিনি সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করেছিলেন। বিন্ধ্যের দক্ষিণেও কোনো কোনো দেশ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বিপুল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর রূপে দীর্ঘকাল বিরাজমান থেকে তিনি পরিণত বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

কিন্তু এই মতও স্পষ্টতঃই গ্রহণযোগ্য নয়। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের ক্ষেত্রে চন্দ্ররাজকৃত বঙ্গাভিযানের কী ব্যাখ্যা হতে পারে তা তিনি বলেননি। তাছাড়া এই প্রশস্তির লিপি যে গুপ্তযুগের তাতে সন্দেহ নেই একথা একটু আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এ লিপি সাতশো বছর আগের মৌর্যযুগের হতে পারে না।

এস.কে. আয়েঙ্গার ও রাধাগোবিন্দ বসাক এই চন্দ্ররাজকে গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বলে মনে করেন। তাঁদের যুক্তি এই রকম -

গুপ্তবংশের অভ্যুদয় ও পশ্চিম ক্ষত্রপদের অবক্ষয় একই সঙ্গে ঘটেছিল। পশ্চিম ক্ষত্রপদের মূল শক্তিকেন্দ্র ছিল মালবে। পশ্চিমে গুজরাট ও দক্ষিণ পশ্চিমে কোঙ্কণেও তাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু প্রথম প্রবরসেনের অধীনে বাকাটক

Scanned with CamScanner

শক্তি তাঁর শাসনকালের শেষ দিকে বা তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী কালে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়। সেই সময় উদীয়মান গুপ্ত রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পরাক্রমে বাকাটকশক্তির নিগ্রহ আরো ত্বরান্বিত হয়। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত যদি এতটাই সাফল্য লাভ করে থাকেন তাহলে ক্ষত্রপদের অধিকৃত সমগ্র ভূখণ্ড অতিক্রম করে তাঁদের মিত্রগণের ("হিন্দু"দের দ্বারা বাহ্লীক বলে অভিহিত) পরাভবও তাঁর দ্বারা অনায়াসে সাধিত হওয়া অসম্ভব নয়। মেহরৌলি স্তম্ভলেখের বিষয়বস্তু সমীক্ষণ করে বসাকের মনে হয়েছে চন্দ্ররাজ সমুদ্রগুপ্তের পিতা ও গুপ্তবংশের প্রথম মহারাজাধিরাজ যিনি পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ, সিন্ধুর দ্বার দিয়ে পঞ্জাব এবং দক্ষিণদেশ জয়ের ইচ্ছায় দিগ্বিজয় যাত্রা করেন। বসাকের মতে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর সমুদ্রগুপ্তের আদেশে চন্দ্রগুপ্তের স্থাপিত বিষ্ণুধ্বজরূপ লৌহস্তম্ভে এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু এই মতও দোষদুষ্ট। সমুদ্রগুপ্তই গুপ্তবংশের প্রথম রাজা যিনি পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে দিগ্বিজয় করেন। তার প্রমাণ এলাহাবাদ প্রশস্তি। স্তম্ভলেখে উক্ত যাবতীয় অঞ্চল যদি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আমলেই বিজিত হয়ে থাকে তাহলে সমুদ্রগুপ্তের আবার সেগুলি জয় করার কথাই ওঠে না। স্তম্ভটি যেখানে প্রথমে ছিল বলে এতকাল পণ্ডিতেরা অনুমান করে এসেছেন, সেই দিল্লীর আশে পাশের অঞ্চল চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাছাড়া কোনো আকরেই প্রথম চন্দ্রগুপ্তের বিষ্ণুভক্তির কথা পাওয়া যায় না।

কোনো কোনো পণ্ডিত শুশুনিয়া অভিলেখে উল্লিখিত চন্দ্রবর্মার সঙ্গে চন্দ্ররাজকে অভিন্ন মনে করেন। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাছে শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ এই অভিলেখে পুষ্করণার অধিপতি সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর উদ্দেশে বিহিত কোনো দানের (সম্ভবতঃ গুহা) উল্লেখ আছে। এই পুষ্করণার অবস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের নানারকম মত রয়েছে। যেমন - রাজস্থানের অন্তর্গত যোধপুরের পোখরান বা আজমীরের নিকটবর্তী পুষ্কর। ৪৬১ মালবাব্দের (৪০৪ খ্রিস্টাব্দ) মান্দাসোর অভিলেখে সিংহবর্মার পুত্র ও চন্দ্রবর্মার ভ্রাতা নরবর্মার নাম আছে। অর্থাৎ চন্দ্রবর্মা সত্যই সিংহবর্মার পুত্র ছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন চন্দ্রবর্মা নামধারী কোনো রাজা রাজস্থান থেকে বঙ্গদেশে এসে শুশুনিয়া পাহাড়ে নিজের আগমনের চিহ্ন রেখে গেছেন। মেহরৌলি স্তম্ভলেখের বঙ্গেষ্বাহববর্তিনো .....ইত্যাদি উক্তি তার প্রমাণ। তাছাড়া চন্দ্রবর্মা ও চন্দ্ররাজ উভয়ই বিষ্ণুভক্ত।

কিন্তু এই মতও সমর্থনযোগ্য নয়। শুশুনিয়া অভিলেখে চন্দ্রবর্মার কোনো বিজয়কীর্তি উল্লিখিত হয়নি। তাই বঙ্গদেশের কোনো অঞ্চল তিনি জয় করেছিলেন এ কথা প্রমাণ করা যায় না। আর শুশুনিয়া অভিলেখের পুষ্করণ বা পুষ্করণাকে

Scanned with CamScanner

বাঁকুড়া জেলার দামোদর তীরবর্তী ও শুশুনিয়া পাহাড়ের ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত পোখরন্ বা পোখর্নের সঙ্গে নিশ্চিত ভাবেই শনাক্ত করা গেছে। তাই চন্দ্রবর্মা দক্ষিণপূর্ব বঙ্গের কোনো ক্ষুদ্র স্থানীয় রাজা ছিলেন মনে হয়। আলোচ্য অভিলেখের চন্দ্ররাজ কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজাধিরাজ ছিলেন। অভিলেখের *ঐকাধিরাজ্য* শব্দ তার প্রমাণ।

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও দীনেশচন্দ্র সরকার অকাট্য যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন এই চন্দ্ররাজ গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন আর কেউ হতে পারেন না। তাঁদের যুক্তিগুলি সংক্ষেপে পরিবেশিত হচ্ছে -

রাধাকুমুদের মতে মেহরৌলি লৌহস্তম্ভের লিপির সঙ্গে এলাহাবাদ স্তম্ভলিপির অক্ষরগত যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এটিকে উত্তরভারতীয় উত্তরকালীন ব্রাহ্মীর পঞ্চমশতকীয় রূপ বলা যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়কালও খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতক।

দ্বিতীয়তঃ, যে সব গুপ্ত রাজাদের অভিলেখ মথুরায় পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত আদিতম। তাঁর মথুরা অভিলেখ থেকে প্রমাণিত হয় মথুরায় শকেদের অন্তিম শক্তিকেন্দ্র গুপ্তদের সাম্রাজ্যবিস্তারের ফলে ভগ্ন হয়েছিল। শকেদের সঙ্গে গুপ্তদের দীর্ঘস্থায়ী (প্রায় ২০ বৎসরব্যাপী) সংগ্রামের বিশদ বিবরণ পাওয়া না গেলেও পশ্চিম ভারতের সুরাষ্ট্র ও কাথিয়াবাড়ে গুপ্তদের বিজয় ঐ সব অঞ্চলে প্রাপ্ত তৎপূর্ববর্তী শক শাসকদের মুদ্রাসমূহের দ্বারা অনুমিত হয়। আর্যাবর্তের অন্য শক ক্ষেত্রগুলিতে চন্দ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের পরিণতি ঐ অঞ্চলে হয়েছিল বলে রাধাকুমুদ মনে করেন। উত্তরভারতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের এই বিজয় গুপ্ত শক্তিকে দৃঢ় ও সমুন্নত করেছিল। সেই ইতিহাসই সংগ্রহ করা যায় মেহরৌলি স্তম্ভলিপি থেকে। এখানে যে ভাবে চন্দ্ররাজের কীর্তি বর্ণিত হয়েছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।

তৃতীয়তঃ, তিনি এও মনে করেন, সিন্ধুর সপ্ত মুখ অতিক্রম করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বাহ্লীকজয় তাঁর পিতা সমুদ্রগুপ্তের দৈবপুত্রষাহিষাহানুষাহি-রাজ্যজয়ের পথ ধরেই হয়েছিল। দৈবপুত্র প্রমুখকে উত্তরপশ্চিম ভারতে বাহ্লীক পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে পশ্চাদপসরণকারী কুষাণশক্তির অবশেষ বলে মনে করা যায়। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ে যেটুকু ন্যূনতা ছিল, তাঁর সুযোগ্য পুত্র চন্দ্রগুপ্ত তা পূরণ করেছিলেন।

মুদ্রার প্রমাণও এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রচারিত নয়প্রকার তাম্রমুদ্রার মধ্যে অষ্টম প্রকারটির সম্মুখভাগে শ্রীচন্দ্র ও পৃষ্ঠভাগে গুপ্ত এই শব্দ উৎকীর্ণ আছে। নবম প্রকারটির অভিমুখভাগে কেবল চন্দ্র (গুপ্ত উপাধি ব্যতীত)

Scanned with CamScanner

উৎকীর্ণ। অর্থাৎ সম্রাট কেবল চন্দ্র এই নামেও উল্লিখিত হয়েছেন। তাই আলোচ্য প্রশস্তিতেও তাঁর উপাধিবিহীন উল্লেখ হয়েছে এমনটা অসম্ভব নয়। বিশেষতঃ ছন্দের প্রয়োজনে এরকম স্বাধীনতা কবিরা নিয়েই থাকেন। তাঁর কোনো কোনো সিংহনিষূদন মুদ্রায় তাঁকে নরেন্দ্রচন্দ্র ও সিংহচন্দ্র বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে বোঝা যায় তাঁর ব্যক্তিনাম চন্দ্র ও কুলনাম গুপ্ত।

দীনেশচন্দ্র সরকার আলোচ্য অভিলেখের সঙ্গে অন্যান্য অভিলেখের ও মুদ্রাসমূহের তুলনা করে বলেছেন যে, আলোচ্য প্রশস্তিতে উল্লিখিত রাজার নাম চন্দ্র, তিনি দিগ্বিজয়যাত্রা করেছিলেন, তিনি বিপুল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, দিল্লী ও আশেপাশের স্থান তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন - এই সব যুক্তির বলে এই চন্দ্ররাজকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে শনাক্ত করাই সমীচীন। চন্দ্ররাজ ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বিষ্ণুভক্তি এক্ষেত্রে অন্যতম প্রমাণ। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই গুপ্ত বংশের প্রথম পরমভাগবত সম্রাট এবং তিনি আদিমধ্যযুগে ভাগবত ধর্মের পুনরুজ্জীবনের অন্যতম হোতা ছিলেন।

অভিলেখটিতে বেশ কয়েকটি ভৌগোলিক উল্লেখ আছে। সেগুলির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে।

বঙ্গ - আধুনিক বাংলাদেশ। সেই সময়কার বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল নিম্ন পশ্চিমবঙ্গ ও (পদ্মার মোহানা পর্যন্ত) বাংলাদেশের উপকূলভাগের অঞ্চলসমূহ।

বাহ্লিক বা বাহ্লীক - ভান্ডারকরের মতে বাহ্লিক বা বল্‌খদেশ বিপাশানদীর নিকটবর্তী ছিল। কারণ *রামায়ণে*-র অযোধ্যাকাণ্ডে (৬৮, ১৮-১৯) বলা হচ্ছে -

যযুর্মধ্যেন বাহ্লিকান্ সুদামানঞ্চ পর্বতম্।
বিষ্ণোঃ পদং প্রেক্ষমাণা বিপাশাং চাপি শাল্মলীম্।।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেও একে ভারতের উত্তরে স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সরকার বলেছেন, *রামায়ণে*-র শ্লোকে বাহিকান্/বাহীকান্ এর স্থানে ভ্রমবশতঃ বাহ্লীক পাঠ রয়েছে। নিন্দিত বাহীকদেশ বা পাঞ্জাব বিপাশা ইত্যাদি নদীর মাঝে অবস্থিত। মহাভারতে-ও (৮।৪৪।৭,৪১) তার সমর্থন আছে। তাছাড়া আলোচ্য অভিলেখানুসারে বাহ্লিক সিন্ধুমুখসমূহ অতিক্রম করে অবস্থিত ছিল। কারো কারো মতে বালুচিস্তানের কোথাও তার অবস্থান ছিল। ডি.বি.ডিস্‌কল্‌কর বলেছেন ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সিন্ধু অতিক্রম করে এই দেশকে খুঁজতে হবে। সেই দেশ তাঁর মতে আধুনিক সিন্ধ্।

Scanned with CamScanner

সিন্ধুর সপ্ত মুখ - Vogel-এর মতে এখানে সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের সপ্ত সিন্ধু অর্থাৎ সিন্ধু ও তার উপনদীগুলির কথা বলা হচ্ছে। প্রবীরনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন ".....the territory concerned could have been in c. third century AD, a settlement of the Tokharians (Yüeh-chih), who could be also called Bāhlika (Bactrian) in Baluchistan to the west of the lower Indus region (where were the 'mouths of the Indus')."

দক্ষিণ জলনিধি - ভারত মহাসাগর।

বিষ্ণুপদগিরি - রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড ৬৮, ১৮-১৯) ও মহাভারতের (৩।৭৩।৮ ইত্যাদি; ১০৩-ও দ্রষ্টব্য; ৩।১৩৮।৮) সাক্ষ্য অনুযায়ী এই পর্বত কুরুক্ষেত্র ও বিপাশার নিকটবর্তী। চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর মতে হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ড হরি কি পৌড়ি বা তার নিকটস্থ স্থানকে বিষ্ণুপদ বলা হত। জয়সোয়ালের মতে হিমালয় হরিদ্বারের কাছে বিষ্ণুপদীই এই স্থান। কিন্তু রামায়ণ ইত্যাদির সাক্ষ্য অনুযায়ী বিষ্ণুপদ বিপাশা নদীর কাছে, গঙ্গার নয়। মহাভারতে আবার বলা হয়েছে যে সেখান থেকে কাশ্মীরমণ্ডল দৃশ্যমান ছিল। জে.সি. ঘোষের মতে প্রাচীন আর্যভূমে বিপাশার উদ্ভব কাশ্মীরের পর্বতে হয়েছিল। কাশ্মীরমণ্ডল থেকে নির্গত হয়ে এই নদী সপ্তসিন্ধুদেশ বা পঞ্জাবে পৌঁছে গুরুদাসপুর ও কাংড়ার সীমানায় তীব্র বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি মনে করেন ঐখানেই বিষ্ণুপদগিরির অবস্থান।

Scanned with CamScanner